বাংলাদেশের সংবিধান
ইতিহাসের পুনর্পাঠ

কাজী জাহেদ ইকবাল

বাংলাদেশের সংবিধান
ইতিহাসের পুনর্পাঠ

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

লেখকের কথা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর এদেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা হবে এমনটি আশা করা গিয়েছিল; কিন্তু সে স্বপ্ন পুরোপুরি পূরণ হয়নি। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, উল্টো যাত্রার ভেতর দিয়ে চলেছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতে এমন সব অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সংযোজন-বিয়োজন এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন দেখা গেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াতে আর দেখা যায়নি। সুতরাং সেদিক বিচারে এদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বিষয়ে গবেষকদের কৌতূহলী হওয়ার কথা; যদিও বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা খুব সামান্যই হয়েছে এবং এ বিষয়টির ওপর গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্যই বলতে হয়। আমি সে অভাব পূরণের উদ্যোগ থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি লিখেছি সে কথা বলছি না। তবে গ্রন্থটি গবেষণার মাধ্যমেই রচিত, এটুকু বলতে পারি।

বইটি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় অনেকেই অকৃপণভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, পিএইচডি গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বইয়ের অধ্যায়গুলো খসড়া আকারে নিরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁর এই অপার স্নেহ আমাকে অভিভূত করেছে, কৃতজ্ঞ করেছে। আমার আরেক শিক্ষক ড. আবুল কাশেম বইয়ের পরিকল্পনার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, আবার প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটিয়ে দিয়েছেন।

এ ঋণ অপরিশোধ্য। আমার পিতা-মাতা, স্ত্রী কেয়া এবং কন্যারা উৎসাহ দিয়ে কাজটি সহজ করে দিয়েছেন; আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ অনেকটাই দুরূহ হওয়া সত্ত্বেও সে দায় কাঁধে নিয়েছেন কথাপ্রকাশের কর্ণধার জসিম উদ্দিন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছি গ্রন্থটির গবেষণা মান ঠিক রাখতে; কতটা পেরেছি সে বিচারের ভার পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আলোচনা-সমালোচনার আলোকে গ্রন্থটির মান আরও বাড়ানোর ইচ্ছা রইল।

ভূমিকা

প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান একটি অতি প্রয়োজনীয় অনুশাসন সমষ্টি। রাষ্ট্র পরিচালনায় এই অনুশাসনের কোনো বিকল্প নেই। সকল রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি সংবিধানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সংবিধানকে অনড়-অচল হলে চলে না; কেননা তার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে। ফলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবিধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুযোগও থাকতে হয়। দেশ-কাল-সময় ভেদে সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতিগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়; আবার তাত্ত্বিকভাবেও সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতিগত ভিন্নতা বিদ্যমান।

সংবিধান পরিবর্তনের নিয়ম-কানুন সংবিধানের মধ্যেই উল্লেখ করা থাকে। সে বিধানকে বিশেষজ্ঞরা তাত্ত্বিক কাঠামোর ভেতর সাধারণীকরণের মাধ্যমে আলোচনা করে থাকেন এবং তা সম্ভব হয় এ কারণে যে, দেশগুলোর ভেতর সংবিধান পরিবর্তনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের প্রবণতা বিদ্যমান।

বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই কোনো না কোনো সাংবিধানিক মডেল অনুসরণ করে থাকে। যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গনচীন এ সকল দেশই সাধারণত মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ-ভারতসহ অনেক দেশ যুক্তরাজ্যের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার অনুসারী। অবশ্য ১৯৭৫ সালের পর বেশ কিছু বছর বাংলাদেশ আংশিকভাবে হলেও মার্কিন সাংবিধানিক মডেল অনুসরণ করেছে।

যখন সংবিধান প্রণীত এবং গৃহীত হয়, তখন তো জনগণের প্রধান বিশ্বাস ও স্বার্থকে অথবা পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এবং স্বার্থের আপস ব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করতে চায়।[১] বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ও ওই একই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। ফলে ভবিষ্যতেও যাতে কোনো জটিলতা না হয় সেজন্য জনগণের

পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস প্রতিফলিত করার স্বার্থে সংবিধান সংশোধনের একটি বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনীর একটি আনুষ্ঠানিক বিধান সংবিধানে উল্লেখ থাকে; কিন্তু এর বাইরে আরও নিয়ন্ত্রক শক্তিও বিদ্যমান থাকে যার মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন হয় অনেক সময়।[২] বাংলাদেশে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর পরও যে রূপ লাভ করেছিল, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ৮ম সংশোধনীর আংশিক বাতিল করে দেওয়ায় সে রূপ আর থাকেনি।[৩]

সংবিধান কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে একটি জনগোষ্ঠী এটি প্রণয়ন করে থাকে। অবশ্য সংবিধান আইন বহির্ভূত উৎস উৎসারিত[৪], যদিও সে রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস। এই অতি প্রয়োজনীয় দলিলটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংশোধনীর দিক বিচারে দুই রকম হয়ে থাকে। প্রথমত, সু-পরিবর্তনীয় সংবিধান কোনো প্রকার বিশেষ পদ্ধতি ছাড়াই সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই সংশোধন করা যায়। আর দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

সংবিধান সংশোধন সব সময় শুধু পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে সম্পন্ন করা যায় না বরং কখনো সংবিধানের মূল সুরের ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ সংবিধান সংশোধন শুধু সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে সফলতার ওপরই সব সময় নির্ভর করে না; একই সঙ্গে সংশোধনটি সংবিধানের মূলসুর অনুসারী কি না, তার ওপরও নির্ভর করে। সংবিধানের মৌলিক চরিত্রবিরোধী কোনো সংশোধনী নিজ থেকেই বাতিল। অবশ্য যেসব দেশে সাংবিধানিক বা সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত সেখানেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ এর একটি ভালো উদাহরণ।[৫] বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(২) অনুসারে অন্য কোনো আইন যদি সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে ওই আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটি বাতিল হবে।[৬] এখন প্রশ্ন আসে যে, এই অন্য আইন বলতে সংবিধান সংশোধনের বিষয়টিও বিবেচিত হবে কি না। বিষয়টি বিবেচনা করে বিচারপতি মোস্তফা কামাল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, অনুচ্ছেদ ৭(২)এ বর্ণিত বিধি-নিষেধ সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।[৭] ফলে সংবিধান শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারে বা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সংসদের মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব নয়। এ কারণে ১৯৮৮ সালের ৮ম সংশোধনী বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আংশিকভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছিল পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী এবং একইভাবে পরবর্তী সময়ে বাতিল হয়েছে।[৮] সুতরাং সাংবিধানিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইচ্ছামতো সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা সংসদের হাতে নেই। তবে এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, বাংলাদেশে যতবার সংবিধান

সংশোধন করা হয়েছে তার প্রত্যেক বারই সংবিধানের প্রাধান্যের বিষয়টি মান্য করা হয়েছে কি না? বিষয়টি পর্যালোচনা প্রয়োজন।

সংশোধনীসমূহ পর্যালোচনার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল সংশোধনী বিচার করা হবে। সময়কাল ধরা হয়েছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত। সময়কাল নির্ধারণে একটি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হয়। সংবিধান ছিল সংসদীয় সরকারব্যবস্থা এবং যথার্থ ক্ষমতা বিভাজন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সংবিধান গ্রহণ করার সালকে গবেষণার শুরুর সময় হিসেবে ধরা হয়েছে; উদ্দেশ্য সংবিধান বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে কীভাবে পরিবর্তন হয়েছে এবং কীরূপ পরিগ্রহ করেছে তা দেখা। ১৯৮৮ সালকে ধরা হয়েছে গবেষণার সমাপ্তিলগ্ন হিসেবে। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের বিচার বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় একটি মৌলিক বাঁকবদল করা হয়। ফলে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে গবেষণা শুরু ও শেষের সময়কাল হিসেবে ধরা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যবর্তী সময়েই ঘটেছে অন্য সংশোধনীসমূহ। সকল সংশোধনী পৃথক পৃথকভাবে বিচার করলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার পথপরিক্রমাও স্পষ্ট হবে। এজন্য ১৯৭২ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সব সংশোধনীই বিশ্লেষণ করা হবে।

সংবিধান সংশোধন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হলেও এর সঙ্গে একটি দেশের সার্বিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রক্রিয়ার বহির্প্রকাশ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলেও সেটিই দেখা যাবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের অভাব, দীর্ঘ স্বৈরশাসন, গণঅভ্যুত্থান, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতালিপ্সা সব কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়ার ভেতর এবং সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরও যে এক ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক প্রভাব বিদ্যমান তা আমরা দেখতে পাব সংবিধান সংশোধনীর পর্যালোচনার ভেতর।

১৯৭২ সালে যখন প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হয় তখন মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের মানুষের যে মনোভাব ছিল সেটিই প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রথম সে সংবিধান ছিল সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংবিধান।[৯] সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রধান তিন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ভারসাম্যপূর্ণভাবে বিভাজন করা হয়েছিল। একই সঙ্গে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। এমনকি কোনো নিবর্তনমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না।[১০] এমনি একটি

সংবিধান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংশোধনীর ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বলা যায় একসময় একদম সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই সংবিধানে সংশোধনীর পদ্ধতি বিদ্যমান। সে কারণে প্রধান সাংবিধানিক প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে এদেশের একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্রিটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রধান গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয় তা একটি তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া স্পষ্ট হবে। এর সঙ্গে সংবিধান সংশোধনী বিষয়ে গবেষকরা যেসব তাত্ত্বিক কাঠামোর চিন্তা করেন সেসবও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। তাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে স্পষ্ট হবে কী কী বিষয় সংবিধান সংশোধনীর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং এর পদ্ধতিটিই বা কীরূপ।[১১] বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধান সংশোধনীর একটি বিস্তারিত এবং স্পষ্ট বিধান প্রদান করা আছে।[১২] কিন্তু তারপরও বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে এ কারণে যে, সংবিধান সংশোধনের কোনো অবাধ অধিকার সংসদের হাতে নেই। লিখিত সংবিধান হওয়ার কারণে সংবিধানে স্পষ্ট করে দেওয়া আছে সংসদ কতটুকু সংবিধান সংশোধনে সমর্থ এবং কতটা নয়। এক্ষেত্রে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদকে অন্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূলসুরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। সংবিধানের মূলসুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে সংবিধান সংশোধন কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। গত তিন দশকে বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন বিষয়ে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাংবিধানিক আইন এই বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশে সাংবিধানিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, সংসদীয় নয়; বিষয়টি সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবেই আছে।[১৩] ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অন্য কোনো আইন যদি সংবিধানবিরোধী হয় তবে যতটা বিরোধী ততটা বাতিল। এখন প্রশ্ন ওঠে এই অন্য আইন বলতে সংবিধান সংশোধনীকেও বোঝানো হয় কি না। আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ মামলায় বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ছিল যে, অন্য আইন বলতে সংবিধান সংশোধনীকেও বোঝাবে।[১৪]

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট সংশোধন হয়েছে আটবার। এর প্রতিটি সংশোধনীই আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সংবিধান গ্রহণ করার এক বছরের ভেতরই দুটি সংশোধনী পাশ করা হয় এবং এর একটি অন্তত সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল। ১৯৭৯ সালের ভেতর সংবিধানের মৌলিক চরিত্রই পরিবর্তন করে ফেলা হয়। ১৯৭৫ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সেনা শাসন বৈধ করা তো হয়ই, একই সঙ্গে একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির হত্যাকাণ্ডের বিচারও

বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার ১৯৯১ সালে একাদশ, দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংসদীয় গণতন্ত্র; ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে আসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিনব পদ্ধতি, যদিও এসব সংশোধনী বর্তমান গবেষণার অংশ নয় তবুও উল্লেখ করা হলো। ফলে দেখা যাচ্ছে সংশোধনীসমূহ বহুমুখী। সরাসরি ব্যক্তিস্বার্থে সংবিধান সংশোধনীর অন্তত দুটি উদাহরণও আছে। সব সংশোধনীকে একত্রিত করে তাই সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। প্রতিটি সংশোধনীরই পৃথক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

সংশোধনীসমূহ দ্বারা কখনোই পুরো সংবিধান বদল করা হয়নি। সংবিধানের বিশেষ বিশেষ বিধান বদল করা হয়েছে। এই বিশেষ বিধান বদলের মাধ্যমেই পুরো সংবিধানের মৌলিক চরিত্রই পরিবর্তন করা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্যন্ত সংশোধন করে প্রথম সংবিধানে গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বদলে দেওয়া হয়েছে। আবার সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা বা বহুদলীয় ব্যবস্থা থেকে একদলীয় ব্যবস্থায় গমন বা সেনাশাসন বৈধকরণ সবই হয়েছে নির্দিষ্ট বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে।

সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন যখনই উঠেছে তখনই সারাদেশে সংসদের ভেতরে এবং বাইরে এ বিষয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তবে সেসব আলোচনা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়েছে। সংসদের ভেতরে আলোচনা হয়েছে এক দৃষ্টিকোণ থেকে, বাইরে হয়েছে অন্যভাবে, আবার বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন তাত্ত্বিক দিক বিচার করে। একই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে সকল সংশোধনীতে সমানভাবে আলোচনা-সমালোচনাও হয়নি। যেমন চতুর্থ সংশোধনীর সময় জাতীয় সংসদের অভ্যন্তরেই আলোচনা হয়নি। আবার সামরিক শাসনসমূহ যখন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে, তখন সে বিষয়ে কি সংসদের ভেতরে, কি সংসদের বাইরে বিশেষ সমালোচনা করা সম্ভব হয়নি। আবার একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংশোধনী নিয়ে বিস্তর গবেষণা, আলোচনা, পর্যালোচনা হয়েছিল। একটি সংশোধনী স্পষ্ট করে বললে ৮ম সংশোধনী আবার বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনায় বাতিলও হয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি সংশোধনী আলাদাভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

বর্তমান বইয়ে একই সঙ্গে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন উভয়ই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় শ্রেণির উপাত্ত উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল প্রভৃতি। প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে সংসদীয় বিতর্ক, সংশোধিত বিধিসমূহের সরকারি প্রজ্ঞাপন, সংবিধান ও পত্র-পত্রিকা।

তথ্যনির্দেশ

১. কে সি হোয়ের, (অনুবাদ আজিজুর রহমান চৌধুরী) আধুনিক সংবিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮) পৃ. ৮৬।

২. বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, ওই, পৃ. ৮৬-১৭৫।

৩. Anwar Hossain Chowdhury V Bangladesh, Bangladesh Legal Decisions, 1989 (SPL). (Dhaka : DLR Publication 1989)

৪. P.J. Fitzgerald, Salmand on Jurisprudence, Twelfth Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1966) P. 84.

৫. বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, Justice Mustafa Kamal, Bangladesh Constitution: Trends and Issues (Dhaka University Press, 2001) P.P. 17-18, Mahmudul Islam, Constitutional Law of Bangladesh (Dhaka: Mullick Brothers, 2002) P.P. 66-69.

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৭. Kudrat-E-Elahi V Bangladesh, 44 DLR (AD) (Dhaka: DLR Publication year) P.P. 319, 346.

৮. BLD (SPL) (Dhaka: DLR Publication year), The Law Reporter, (SPL), (Dhaka: The Reporter, 2011), BLD, (SPL), (Dhaka: Bangladesh Bar Council, 2010)

৯. Mahmudul Islam, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১০. বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, ওই, পৃ. ১৪-১৪।

১১. বিস্তারিত পাঠের জন্য দেখুন, কে.সি. হোয়ের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-১৭৫।

১২. অনুচ্ছেদ ১৪২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, পৃ. ৬০।

১৩. ওই, পৃ. ৩।

১৪. Anwar Hossain Chowdhury V. Bangladesh, প্রাগুক্ত।

সূচি

প্রথম অধ্যায় : সাংবিধানিক ইতিহাস : শুরুর কথা ১৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : মুসলিম শাসনামলে বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ২৯
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলার সাংবিধানিক ইতিহাস ব্রিটিশ আমল ৪৫
চতুর্থ অধ্যায় : পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া : ১৯৪৭-১৯৬২ ১১৯
পঞ্চম অধ্যায় : প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আইনগত ও সাংবিধানিক ভিত্তি ১৪১
ষষ্ঠ অধ্যায় : ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও এর আইনগত ভিত্তি ১৫৫
সপ্তম অধ্যায় : সংবিধান সংশোধনী : তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত ১৬৬
অষ্টম অধ্যায় : বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ১৯৬
সংবিধানের প্রথম সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২০১
সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২০৮
সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২১৭
সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২২৩
সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২৩৬
সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২৪৬
সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২৫০
সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী : প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ২৫৪
অন্য সংশোধনীসমূহ ২৫৮
নবম অধ্যায় : তত্ত্বাবধায়ক সরকার : সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় নতুন তত্ত্ব ২৬২
উপসংহার ২৭৯
পরিশিষ্ট-১ : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সংবিধানে ক্ষমতা কাঠামো ২৮৪
পরিশিষ্ট-২ : বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাসে জনস্বার্থে মামলার গুরুত্ব ৩০৩